অধ্যাপক কাদেরকে আমরা কি ভুলতে বসেছি?

গোলাপ মুনীর

অধ্যাপক আবদুল কাদের যথার্থ অর্থেই অনুধাবন করতে পারতেন, কখন কোন দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। শুরুতেই তার উপলব্ধি ছিল কমপিউটারকে নিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। তাই তিনি কমপিউটার জগৎ-এর সূচনা সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করলেন এর দাবিধর্মী শিরোনাম নাম দিয়ে : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারকদের জানিয়ে দিলেন অভিজাত সম্প্রদায় নয়, সাধারণ মানুষই পারে এ দেশের অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে।

প্রতিটি জাতিই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বদের গুরুত্বের সাথে স্মরণ করে তার মৃত্যুর পরবর্তী সময়েও। এই স্মরণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয় জাতীয় কর্মকাণ্ডে নিজেদের বেশি থেকে বেশি হারে সম্পৃক্ত করে জাতীয় জীবনে আরও বৃহত্তর পরিসরে অবদান রাখার ব্যাপারে। এভাবেই প্রতিটি জাতি তার এগিয়ে চলাকে নিশ্চিত করে। কিন্তু আমরাই বোধ হয় এ ধরনের অনুশীলনে সীমাহীন পিছপা। বরং আমরা আমাদের জাতীয় ব্যক্তিদের অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে চাই না। পারলে জাতীয় ব্যক্তিদের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো অস্বীকার করে শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই তুলে ধরায় অতি মাত্রায় আগ্রহী। ফলে কেউ যদি জাতির জন্য কোনো অবদান রাখেন, সে অবদান বড় হোক, ছোট হোক– তা স্বীকার করে জাতীয়ভাবে তার প্রতি স্বীকৃতি জানাই না। এখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থও যে কাজ করে না, তা নয়। এর বাইরেও কাজ করে আরও নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। বিষয়টি মনে পড়ল কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ অধ্যাপক আবদুল কাদেরের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটিকে সামনে রেখে। উল্লেখ্য, তিনি ২০০৩ সালের ৩ জুলাই ইন্তেকাল করেন।

দৃশ্যত তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের একজন শিক্ষক। সেখান থেকে তাকে প্রেষণে নেয়া হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে। মৃত্যুর সময় সেখানে তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন এ অধিদফতরের একজন উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে। কার্যত তিনি ছিলেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। মাসিক কমপিউটার জগৎ-কে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার এক সাহসী আন্দোলন। সে জন্য তিনি এবং তার কমপিউটার জগৎ সমান্তরালভাবে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সমাজে অভিহিত তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে। তার মৃত্যুর পর থেকে আমরা শুনে আসছি, তাকে সরকারি সে স্বীকৃতি দেয়া হবে। তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে অনেকের মুখ থেকে সে দাবি উঠতেও আমরা শুনেছি। সে দাবির সমর্থন উচ্চারিত হতে শুনেছি অন্যদের মুখে, লেখায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে। আজ ২০১৪ সালের ৩ জুলাই। আমরা পালন করতে যাচ্ছি তার একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী। কিন্তু মরহুম আবদুল কাদেরকে আমরা জাতীয়ভাবে সে স্বীকৃতিটুকু এখনও দিতে পারিনি। ফলে মনে হচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এই প্রাণপুরুষটিকে আমরা সময়ের সাথে যেনো ভুলতে বসেছি। এক সময় দেখা যাবে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জানবে না, কে ছিলেন এই আবদুল কাদের। জানবে না তিনি তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার কর্মের মধ্য দিয়ে কী করে নিজেকে করে তুলেছিলেন সত্যিকারের একটি ইনস্টিটিউশন।

আজকের দিনে আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী যেসব শীর্ষ সংগঠন রয়েছে, সেগুলোও মরহুম আবদুল কাদেরের জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিনটিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনের তাগিদটুকু পর্যন্ত অনুভব করে না। ফলে আজকের প্রজন্ম মরহুম আবদুল কাদের ও তার কর্মসাধনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ তার কর্মময় জীবন জানতে পারলে আজকের প্রজন্ম হয়তো তার জীবন থেকে কর্মপ্রেরণার উৎস খুঁজে পেত। এরা জানত, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সত্যিকার অর্থে এগিয়ে নিতে তার ছিল সদর্প অথচ নীরব পদচারণা। এ মানুষটি আজ সব ধরনের চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে। মনে হয়, তার অসাধারণ অবদানের কথা জাতির সামনে তুলে ধরা দরকার। সেই সাথে প্রচারবিমুখ মানুষটির অবদানের প্রতি জাতীয় স্বীকৃতি ঘোষণা দরকার সরকারিভাবে। তাকে 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' হিসেবে ঘোষণা দিলে আমাদের আগামী প্রজন্মের সামনে তাকে জানার পথ যেমনি সহজতর হবে, তেমনি তিনি হতে পারতেন তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে আমাদের আগামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দৃশ্যত তিনি ছিলেন একজন কলেজ শিক্ষক। পড়াতেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান। ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রভাষক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। ১৯৯২ সালের ৮ জুলাই পর্যন্ত এ কলেজেই প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পদোন্নতি পেয়ে ১৯৯৫ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক। ১৯৯৫ সালের ৩ আগস্ট তাকে করা হয় সহযোগী অধ্যাপক এবং পাঠানো হয় পটুয়াখালী সরকারি কলেজে। কয়েক দিন পর ১৩ আগস্ট সেখান থেকে তাকে নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কমপিউটার কোর্স খোলা সংক্রান্ত বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই পর্যন্ত। এরপর দায়িত্ব পান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের নির্বাচিত সরকারি কলেজগুলোতে কমপিউটার কোর্স চালু করা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে। ২০০০ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর ২০০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অসুস্থতার জন্য ছুটি কাটান। ছুটি শেষে এই অধিদফতরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ দায়িত্ব হিসেবে তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই অধিদফতরের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এ তার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। এগুলোর মধ্যে আছে : ঢাকার বিএমডিসি থেকে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ▸

কোর্স। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাংকের কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ঢাকার সাভারে বিপিএটিসি থেকে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স। এ ছাড়া নিয়েছেন কমপিউটার-বিষয়ক ২০টি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ওপর প্রশিক্ষণ, শিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।

সংক্ষেপে এই ছিল তার দৃশ্যমান কর্মজীবন। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটার কোর্স চালু করার ব্যাপারে কাজ করার সময় তিনি উপলব্ধি করতে পারেন তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের মতো গরিব দেশের জন্য সৃষ্টি করতে পারবে অপার সুযোগ। আর তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারই পারে সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়তে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ধীরে প্রস্তুত করছিলেন নিজেকে বেশি থেকে বেশি হারে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে। সেজন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও কমপিউটার বিষয়ে নেন নানা প্রশিক্ষণ। শিখেন কয়েকটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।

একই সাথে উপলব্ধি করেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন একটি মোক্ষম হাতিয়ার, প্রয়োজন একটি তথ্যপ্রযুক্তি গড়ে তোলার বলয়। এ উপলব্ধি সূত্রেই তিনি অনুধাবন করেন একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন, কিংবা বলা যায় আন্দোলনের হাতিয়ার। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন 'কমপিউটার জগৎ' নামে তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক একটি বাংলা সাময়িকী প্রকাশের। সে অনুযায়ী ১৯৯১ সালে ১ মে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা। সে সময়ে একে তো তথ্যপ্রযুক্তি মতো একটি খাটখোট্টা বিষয়, এর ওপর আবার বাংলাভাষায় এ ধরনের একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা ছিল রীতিমতো এক সাহসের ব্যাপার। অধ্যাপক আবদুল কাদেরই তখন সে সাহস দেখাতে পেয়েছিলেন। কারণ, তখন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের ওপর বলতে গেলে তেমন কোনো লেখক-সাংবাদিকই ছিল না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রেমী সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তানকে সাথে নিয়ে তিনি এ কঠিন কাজে নেমেছিলেন। পাশাপাশি অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে উদ্যোগী হতে হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের সাংবাদিক সৃষ্টির কাজে। এ ক্ষেত্রে তার স্থির বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত লেখক সম্মানী না দিলে কেউ আইটি বিষয়ে লিখতে আগ্রহী হবেন না। তাই তিনি কমপিউটার জগৎ-এর লেখকদের যেমনি যথোপযুক্ত সম্মানী দিতেন, তেমনি সময় মতো সম্মানীর অর্থ লেখকদের কাছে পৌঁছাতেন নিজ দায়িত্বে। এর ফলে কমপিউটার জগৎ-কে কেন্দ্র করে তিনি বেশ কয়েকজন লেখক-সাংবাদিক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের অনেকেই আজ আইটি সাংবাদিকতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

একই সাথে তিনি বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, বেসিস এবং এ ধরনের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ খাতের উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি কার্যকর তথ্যপ্রযুক্তি বলয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরাই কার্যত প্রতিনিধিত্ব করেছেন এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। এ ছাড়া তিনি এ দেশের শিক্ষাবিদদেরও কাছে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের সমন্বয়ে অধ্যাপক আবদুল কাদের যে বলয় গড়ে তুলেছিলেন, এরাই ছিলেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি।

অধ্যাপক আবদুল কাদের যথার্থ অর্থেই অনুধাবন করতে পারতেন, কখন কোন দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। শুরুতেই তার উপলব্ধি ছিল কমপিউটারকে নিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। তাই তিনি কমপিউটার জগৎ-এর সূচনা সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করলেন এর দাবিধর্মী শিরোনাম নাম দিয়ে : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারকদের জানিয়ে দিলেন অভিজাত সম্প্রদায় নয়, সাধারণ মানুষই পারে এ দেশের অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে। যেমনটি এ দেশের ইতিহাসে বিস্ময় ঘটিয়েছে এ দেশের সাধারণ কৃষক, আর পোশাক শিল্পকে শীর্ষ পর্যায়ের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খাতে পরিণত করেছে এ দেশের স্বল্পশিক্ষিত কিংবা প্রায় অশিক্ষিত নারীরা, তেমনই এ দেশের সাধারণ মানুষ সুযোগ পেলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করতে পারে, পারে দেশকে সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিতে। তবে এজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের অবাধ ও অপার সুযোগ।

কাঙ্ক্ষিত এ সুযোগ জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছাতে হলে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট পণ্যের দাম কমাতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন শুল্কমুক্ত কমপিউটার ও কমপিউটার পণ্য আমদানির সুযোগ। সেজন্য কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিবেদনের মাধ্যমে অধ্যাপক কাদের জাতির সামনে নিয়ে আসেন 'শুল্কমুক্ত কমপিউটার'-এর দাবি। দাবি করা মাত্রই জনগণের হাতে কমপিউটার যেমন পৌঁছে যায়নি, তেমনই শুল্কমুক্ত হয়ে যায়নি কমপিউটার ও কমপিউটার পণ্য। এজন্য অধ্যাপক কাদেরকে নানা সময়ে আয়োজন করতে হয়েছে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। কখনও করতে হয়েছে সংবাদ সম্মেলন। দেখা করতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের সাথে। দিতে হয়েছে তাগিদের পর তাগিদ। সাথে সাথে চলেছে সারাদেশের সাধারণ মানুষকে কমপিউটার পরিচিত করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজনও। এজন্য আমরা দেখেছি, অধ্যাপক আবদুল কাদের নাজিম উদ্দিন মোস্তানসহ আরও অনেককে নিয়ে বুড়িগঙ্গার ওপারে কমপিউটার নিয়ে গেছেন ডিঙি নৌকায় করে। উদ্দেশ্য, সেখানকার স্কুলছাত্রদের কমপিউটার যন্ত্রটি দেখাবেন, এর সাথে ছাত্রদের পরিচিত করে তুলবেন। এক সময় ভাবলেন কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ের প্রসার ঘটানোও এ দেশে অপরিহার্য। সে অপরিহার্যতা মেটানোর জন্য তিনি দেশে আয়োজন করেন প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে বৈশাখী মেলার সাথে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কমপিউটার প্রদর্শনীর।

দ্রুতগতির ইন্টারনেট ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ-প্রসার কখনই সম্ভব নয়– এ উপলব্ধিও তার যথার্থই ছিল। এজন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলে বাংলাদেশের সংযোগের তাগিদে তার কমপিউটার জগৎ পালন করে অসমান্তরাল ভূমিকা। কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে তিনি ১৯৯২ সালের দিকে জাতিকে অবহিত করেন কক্সবাজার উপকূল শেষে বঙ্গোপসাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া সি-মি-উই-৪ ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কথা। যখন বলা হয়, প্রায় নামমাত্র খরচে আমরা এ সংযোগ পেতে পারি। কিন্তু তখন আমলারা সরকারকে বুঝিয়েছে, এ সংযোগ হলে বাংলাদেশের গোপনীয় তথ্য বিদেশে পাচার হয়ে যেতে পারে। এই ভুল ধারণা ভাঙতে কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে জাতিকে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বহু বছর পর এক সময় সে ভুল ভাঙে। অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে আমাদেরকে সে সংযোগ নিতে হয়। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক প্রয়োগে আমাদের প্রবেশ সম্ভব হতো। এর মাধ্যমে আজ সম্ভব হচ্ছে আউটসোর্সিং করে দেশের বাইরে থেকে অর্থ উপার্জনের, আউটসোর্সিংকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য চাই আরও দ্রুতগতির ইন্টারনেট।

এভাবে অধ্যাপক কাদের কমপিউটার জগৎ-কে হাতিয়ার করে তথ্যপ্রযুক্তি বলয় গড়ে তুলে নানাভাবে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জোরালো প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তার জীবদ্দশায়, যা পুরো বর্ণনা একটি মাত্র লেখায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে এবং তারই প্রতিষ্ঠিত কমপিউটার জগৎ কখনও সফলতা পেয়েছে, আবার কখনও পায়নি। আসলে তিনি সব মহলের ঐক্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সম্পৃক্ত করে নানা প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জাতিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সামনের দিকে। তারই প্রতিষ্ঠিত 'কমপিউটার জগৎ' তার অবর্তমানে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে যাচ্ছে তারই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে।

তারই একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের এই সময়ে আমরা চাই অধ্যাপক আবদুল কাদের শুধু আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হবেন না, বরং হবেন সমগ্র জাতির অনুপ্রেরণার উৎস, যে সূত্রে বাংলাদেশ হবে তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ অনন্য এক দেশ। যে দেশ হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। আর সেজন্য প্রয়োজন অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে জাতীয়ভাবে এ দেশের 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃ' হিসেবে স্বীকৃতি। সে স্বীকৃতি প্রয়োজন আমাদের আগামী প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তির আন্দোলনে সমৃক্ত করার জন্য। অধ্যাপক আবদুল কাদেরের ব্যক্তিগত কোনো লাভ-লোকসানের জন্য নয়। কারণ, তিনি আজ ব্যক্তিগত সব লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে কজ